প্রথম অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটে। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই সময়েই বাংলা ভাগের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শতাব্দী ধরে পরিচিত দিনাজপুর জেলাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এর পূর্বাংশ দিনাজপুর নামেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পশ্চিমাংশ ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। নবগঠিত এই জেলার নাম হয় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

যোগাযোগ ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে পুনরায় দুই ভাগে ভাগ করা হয়। নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে উত্তরাংশের নাম হয় উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণাংশের নাম হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা।

১. মিথ-পুরাণে দিনাজপুর ঃ

কাহিনি, কিংবদন্তি ও মিথ-পুরাণ অনুসারে বহু পূর্ববর্তী যুগ থেকেই দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারত মতে ক্ষত্রিয় রাজা বলি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর পত্নী সুদেষ্ণার সঙ্গে দীর্ঘতমা ঋষির মিলনে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে তাঁরা নিজের নিজের নামে পাঁচটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তখন পুণ্ড্র দিনাজপুর অঞ্চলের অধীশ্বর হন এবং এই অঞ্চল পুণ্ড্রদেশ নামে পরিচিতি লাভ করে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে — "প্রাচীনকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। বগুড়ার সাত মাইল দূরে মহাপ্রস্থানগড়ই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কারণ মৌর্যযুগের একখানি শিলালিপিতে এই স্থানটি পুণ্ড্রনগরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।"[১]

দিনাজপুর অঞ্চলের নানা কাহিনি মহাভারতের বিরাট রাজার নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কথিত আছে, বিরাট রাজার গোশালা ও রাজপ্রাসাদ ছিল এ অঞ্চলের 'বৈরাট্টা' (হরিরামপুর থানা, দঃ দিনাজপুর) এলাকায়। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসকালে এই বিরাট রাজার গোশালায় ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র এক শমিবৃক্ষের কোটরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই প্রাচীন শমিবৃক্ষটি এখনও রয়েছে। রাজার অসংখ্য গোরুর জলপানের জন্যই খনন করা হয়েছিল গৌড়দিঘি, আলতাদিঘি, মালিয়ানদিঘির মতো বিশাল জলাশয়গুলো। রানি ও রাজকন্যাদের স্নানের জন্য ব্যবহার হত নিকটবর্তী হাতিডোবার বাঁধানো ঘাটটি।[২]

অঙ্গরাজ্যের রাজা মহাবীর কর্ণের নাম অনুসারেই নাকি 'করণদিঘি' (করণদিঘি থানা, উঃ দিনাজপুর) নামকরণ হয়েছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে অসু, বেনু, বারজন, নান্‌হা ও কান্‌হা নামে পাঁচ ভাই নিজেদের বসবাসের জন্য গোয়ালপুকুর এলাকায় রাতারাতি দুর্গ তৈরি করেছিলেন। সেজন্য ঐ দুর্গের নাম হয় 'অসুরাগড়' (গোয়ালপুকুর থানা, উঃ দিনাজপুর)।[৩]

নারায়ণের সুদর্শন চক্রের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে কংস রাজার দেহ তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে তিন স্থানে পড়েছিল। রাজার মুণ্ডটি পড়ে করঞ্জি (কুশমণ্ডি থানা, দঃ দিনাজপুর) নামক গ্রামে। ঐ গ্রামের উঁচু ঢিপি, ভাঙা স্তুপ আর অজস্র পাথরের টুকরো এখনও কংস রাজার মুণ্ডের চিহ্ন বহন করে চলেছে। প্রতি বছর মাঘীপূর্ণিমায় কংসব্রত বা কাসব উৎসব এখানে পালিত হয়ে থাকে।

পৌরাণিক যুগে রাজা বাণ এই অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারেই এ রাজ্যের নাম হয় বাণরাজ্য এবং রাজধানীর নাম হয় বাণনগর। এই বাণনগরই বর্তমানে বাণগড় (গঙ্গারামপুর থানা, দঃ দিনাজপুর) নামে পরিচিত। এর পাশেই রয়েছে পুনর্ভবা ও ব্রাহ্মণী নদী। এই নদীর তীরে বাণ রাজার কন্যা ঊষার ঘর 'ঊষাতিটি' ছিল। নারায়ণপুরের (গঙ্গারামপুর থানা, দঃ দিনাজপুর) নিকটে একটি বিশাল ঢিপিকে স্থানীয় লোকেরা এখনও 'ঊষাতিটি' বলে থাকেন।

কথিত আছে যে, দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধের প্রতি প্রেমাসক্ত হন বাণ রাজার কন্যা ঊষা। রাজারানির অনুমতি ছাড়াই গোপনে তাঁদের বিবাহ হয়। তারপর একদিন ঊষাকে নিয়ে অনিরুদ্ধ পলায়ন করেন। যে রাস্তা দিয়ে তাঁরা পলায়ন করেছিলেন, সেই রাস্তা 'ঊষাহরণ রোড' (কুশমণ্ডি থানা, দঃ দিনাজপুর) নামে পরিচিত। রাগান্বিত রাজা বাণ অনিরুদ্ধকে ধরে এনে কারাবন্দি করে রাখেন। খবর পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উদ্ধারের জন্য আসেন এবং উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাণ অত্যন্ত বীরত্ব দেখালেও শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাজিত হন। শ্রীকৃষ্ণ বাণের এক হাজারটি হাতের মধ্যে মাত্র দুটি রেখে বাকি ৯৯৮ টি হাত কর (আঙুল) সহ দাহ করেন। পুনর্ভবা নদীর তীরে যে স্থানে করগুলো দাহ করা হয়, সেই স্থানটিই বর্তমানে 'করদহ' (তপন থানা, দঃ দিনাজপুর) নামে পরিচিত। এটি একটি ইতিহাস বিজড়িত গ্রাম। এখানে দিনাজপুর রাজের একটি ভগ্ন মন্দির রয়েছে, যেটি আঠারো শতকে তৈরি।

ইতিহাসখ্যাত বাণ রাজা তাঁর প্রিয়তমা রানির আদেশে একটি দিঘি খনন করান। রাজা স্বয়ং মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার তৃপ্তি বিধানের জন্য এই দিঘির তীরেই তর্পণ করতেন। তাই দিঘিটির নামকরণ হয় 'তর্পণদিঘি'। কালস্রোতের ধারা বেয়ে মিথ-পুরাণের সেই 'তর্পণদিঘি'ই আজকের বিখ্যাত তপনদিঘি (তপন থানা, দঃ দিনাজপুর)।

এই সমস্ত সূত্র ধরেই সমালোচক ধনঞ্জয় রায় যথার্থই বলেছেন — "মহাভারতের যুগে এই অঞ্চলে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে শকুনি গুপ্তচর রূপে থাকার সময় প্রাচীন দেশের যে

বর্ণনা দেন তার সঙ্গে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক মিল রয়েছে। এই অঞ্চলের নামই পুণ্ড্র দেশ। পুণ্ড্র রাজার নামেই স্থানের নাম পুণ্ড্র। এই দেশের প্রাচীন বিখ্যাত নগরী পুণ্ড্রবর্ধন। পুণ্ড্র দেশের দুটি প্রাচীন নগরের মধ্যে একটি কোটিবর্ষ বা বাণগড় অপরটি গৌড়পুর। এই কোটিবর্ষ নগরই সমগ্র দিনাজপুর অঞ্চল।"[৪]

২. ঐতিহাসিক পরিচয় ঃ

প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত কোটিবর্ষ বা দেবকোট নগরের ধ্বংসাবশেষ বা ইতিহাস বিখ্যাত বাণগড় বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানার শিববাড়ি গ্রামের অদূরে অবস্থিত। ১৯৩৭ সালে বাণগড় খননের প্রারম্ভিক কার্যাবলি শুরু হলেও পাকাপাকিভাবে খনন কাজ আরম্ভ হয় ১৯৩৮ সালের ৬ই মার্চ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ইতিহাসবিদ কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মোট চার পর্যায়ে (১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯, ১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪০-৪১ খ্রিঃ) বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের জন্য খনন কাজ চলে। এই খনন কাজের ফলে বাণগড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।[৫] এই বাণগড়ই যে মৌর্যযুগের কোটিবর্ষ নগর এবং অতীত ইতিহাসের একটি অফুরন্ত তথ্য ভাণ্ডার — তা আজ নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর মতে — "Moreover the Mahasthan inscription (EP Ind Vol - XXI page 85) proves that pundranagar (modern Mahasthan on the river Karatoya in Bogra district) was the seat of Mahamatra during the rule of the Maurya emperors. Whereas Pundranagar was in possession of the Maurya Kings, it is not unreasonable to suppose that Kotivarsha or modern Bangarh also came under their administration. The art of Bangarh of that period proves beyond doubt a well-established of society."[৬]

গুপ্ত যুগের কিছু তাম্রশাসন দিনাজপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় পাওয়া গেছে। এগুলো থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, এই সমস্ত প্রাচীন অঞ্চল সম্ভবত গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার অন্তর্গত বৈগ্রামে পুকুর খননের সময় ১২৮ গুপ্তাব্দ চিহ্নিত তাম্রশাসন পাওয়া যায় — যা প্রথম কুমার গুপ্তের সময় নির্দেশ করে। দামোদরপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশভুক্ত) পাওয়া দুটি তাম্রশাসন জমি ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত। এতে 'কোটীবর্ষ বিষয়' -এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।[৭] এর মধ্যে 'উপকারিকা' নামক তাম্রশাসনটিতে বিক্রয়যোগ্য ভূমিটুকু বৈগ্রামের সীমানায় অবস্থিত বলে উল্লিখিত হয়েছে। ঐ বৈগ্রাম বর্তমান বৈগ্রাম (হিলির নিকটবর্তী) বলেই মনে হয়।

পরবর্তীকালে বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় যুগের সূচনা হয় পালবংশের রাজত্বকালে। গোপাল প্রতিষ্ঠিত পালবংশের রাজাগণ প্রায় চারশো বছর ধরে বঙ্গভূমিতে শাসন চালান। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহিপালের রাজত্বকালে সম্ভবত দিনাজপুরের এই অঞ্চলগুলো বিশিষ্টতা লাভ করে। তাঁর নামের সঙ্গে বিজড়িত বিখ্যাত মহিপালদিঘি (বংশীহারি থানা, দঃ দিনাজপুর) প্রাচীনত্ব ও বিরাটত্বের দিক থেকে আজও আমাদের বিস্মিত করে। মহিনগর বা মাহিনগর (বালুরঘাট থানা, দঃ দিনাজপুর) জনপদটি সম্ভবত তাঁর সময়েই গড়ে উঠেছিল। এছাড়া বাণগড় থেকেও প্রথম মহিপালের নামাঙ্কিত একটি লিপি উদ্ধার হয়েছে। এর থেকে প্রাচীন কোটিবর্ষ বা বর্তমান বাণগড় সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে।

বাণগড় সংলগ্ন ইতিহাসখ্যাত স্থান হল দেবকোট। এটি প্রাচীন বাণগড়ের নিকটেই, বলা চলে প্রায় অভিন্ন স্থান। পালবংশীয় রাজা তৃতীয় দেবপালের নামেই এই জনপদটি ' দেবকোট' বলে পরিচিতি লাভ করে। ঐতিহাসিক ধনঞ্জয় রায়ের মতে — "পুনর্ভবা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সমৃদ্ধ নগর শুধু গুপ্ত যুগ থেকে শাসনকেন্দ্র রূপেই নয়, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং আন্তর্জাতিক স্থলপথ ও বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র রূপেও এই নগরের পরিচিতি ও মর্যাদা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ... মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে বঙ্গদেশে যে ক-টি স্থানে নগরায়ণের কাজ শুরু হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীনতম ছিল মহাস্থানগড়। তার পরেই ছিল দেবকোট।"[৮]

পাল যুগের পরবর্তীকালে বাংলায় সেন রাজাদের রাজত্ব শুরু হয়। এঁদের রাজত্বকাল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের আমলে সাম্রাজ্য বেশ বিস্তার লাভ করে। এই সময় দিনাজপুর এলাকার বহু অঞ্চল তাঁদের শাসনাধীনে আসে। তপন থানার (দঃ দিনাজপুর) মনহলি গ্রাম থেকে লক্ষ্মণ সেনের উৎকীর্ণ একটি তাম্রলেখ পাওয়া গেছে। আনুমানিক ১১৮১ সালের এই তাম্রলেখ ইতিহাসে 'মনহলি তাম্রশাসন' নামে খ্যাত। তপনদিঘি (তপন থানা, দঃ দিনাজপুর) থেকে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের অপর তাম্রশাসনে বরেন্দ্রভূমির বেলাহিস্তি নামক একটি গ্রাম দানের উল্লেখ রয়েছে।

দিনাজপুরের এই দুই জেলায় পাল ও সেন যুগের অজস্র ঐতিহাসিক উপাদান নিদর্শনরূপে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তপনদিঘি, ধলদিঘি, কালদিঘি, মহিপালদিঘি, মালিয়ানদিঘি, গৌড়দিঘি, আলতাদিঘি প্রভৃতি জলাশয় আজও উৎসাহী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এখনও খনন কাজের সময়, পুরাতন পুকুর সংস্কারের সময় কালো পাথরের তৈরি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বেই ইটালঘাটি (হরিরামপুর থানা, দঃ দিনাজপুর) ও জাজিয়ার (তপন থানা, দঃ দিনাজপুর) গ্রাম থেকে পুকুর খননের সময় বেশ কয়েকটি এরকম মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। এগুলোর কিছু বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়াম এবং জেলা প্রত্ন বিভাগের

মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। আর কিছুকিছু নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে। তপন থানার ভিকাহার গ্রামে একটি প্রাচীন বিন্দুবাসিনী দেবীর মন্দির আছে। এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এখনও পাথরে নির্মিত দেবদেবী ও জীবজন্তুর মূর্তি পাওয়া যায়। ভিকাহারের অদূরে ভাইওর (তপন থানা) গ্রাম। এখানে ১৬ হাত দশভুজার মূর্তি পাওয়া গেছে। কালো পাথরে তৈরি মূর্তিটিকে স্থানীয় মানুষেরা এখনও পূজা করেন। কুশমণ্ডি থানার পঞ্চনগরে প্রাচীন হিন্দু কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। চোপড়া থানার (উঃ দিনাজপুর) 'অসুরগড়' নামে পরিচিত স্থানটিও একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মাত্র। বাজে বিন্দোলের (রায়গঞ্জ থানা, উঃ দিনাজপুর) পৌরাণিক মন্দিরটিকে স্থানীয় জনগণ পাল যুগের তৈরি বলে মনে করেন।

তুর্কিবীর বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ সালে নবদ্বীপ জয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম আধিপত্যের সূচনা করেন। ফলে বাংলায় সুলতানি যুগের সূত্রপাত ঘটে। সুলতানি যুগের সুদীর্ঘ শাসনকালেও দিনাজপুরের এই অঞ্চলের কিছু কিছু স্থানের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দেবকোট -এর নাম (বর্তমানে গঙ্গারামপুর)।

নবদ্বীপ অধিকারের পর বখতিয়ার খিলজী ক্রমশ উত্তর দিকে অভিযান করেন এবং লক্ষ্মণাবতী বা 'লখনৌতি' জয় করেন। এরপর তিনি আরও উত্তরে এগিয়ে যান এবং ১২০৫ সালে প্রাচীন দেবকোটে উপস্থিত হন। এখানে তিনি একটি আবাসস্থল, কর্মকেন্দ্র এবং সামরিক শিবির স্থাপন করেন। দেবকোট জয়ের অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তিব্বত জয়ের সংকল্প নেন। ফলস্বরূপ তিনি এখান থেকেই ১২০৬ সালে তিব্বত অভিযান করেন। পথে কামরূপরাজের অসহযোগিতার ফলে ব্যর্থ হয়ে পুনরায় দেবকোটেই ফিরে আসেন। ঐ বছরই অসুস্থ হয়ে বখতিয়ার খিলজীর মৃত্যু হয়। মতান্তরে তাঁর অনুচর আলি মর্দানের হাতে তিনি নিহত হন।

দেবকোটের নতুন সুলতান হলেন আলি মর্দান। আলি মর্দানের মৃত্যুর (১২১৩ সাল) পরও ১২২৭ সাল পর্যন্ত সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ খিলজীর শাসনকালের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেবকোটই ছিল তাঁদের রাজধানী এবং শাসকদের প্রধান কর্মস্থল। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে — "বখতিয়ারের জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পর পর্যন্ত বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোট (আধুনিক নাম গঙ্গারামপুর) বাংলার মুসলিম শক্তির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল।"[৯]

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ খিলজীর শাসনকালেই ১২২৯ সালে দেবকোট রাজধানীর মর্যাদা হারায়। ঐ বছরই তিনি রাজধানী দেবকোট থেকে লখনৌতিতে স্থানান্তরিত করেন। দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দিনের হাতে তিনি পরাজিত হন। এরপর নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেবকোটের ইতিহাস এগিয়ে চলে। এসময় প্রায় পনেরোজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সিংহাসন লাভের সুযোগ পান। পরবর্তীকালে (১২৮২ সালে) বাংলার শাসক হন দিল্লির সুলতান

গিয়াসউদ্দিন বলবনের পুত্র বুঘরা খান। তখন তিনি তাঁর রাজ্যকে প্রধান চারটি অংশে ভাগ করেন। এই চার অংশের মধ্যে দেবকোট অন্যতম প্রধান বিভাগ ছিল।

এর বেশ কিছুকাল পরে ১৩৪২ সালে ইলিয়াস হাজি ষড়যন্ত্র করে আলাউদ্দিন আলি শাহকে হত্যা করে শামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ করে লখনৌতি রাজ্যের সুলতান হন। এই সময় দিল্লির সুলতান ছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক। শামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ বিভিন্ন রাজ্য জয় করার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন তুঘলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক অঞ্চল দখল করে নেন। ফলে ফিরোজ শাহ তুঘলক ক্রুদ্ধ হন এবং ১৩৫৩ সালে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বঙ্গ আক্রমণ করেন। তখন ইলিয়াস শাহ লোকজন সরিয়ে একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় নেন। ইতিহাসখ্যাত একডালা দুর্গই সেসময় হয়ে উঠেছিল সুলতান ইলিয়াস শাহের প্রধান আশ্রয়স্থল এবং যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একডালা দুর্গটি বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুশমণ্ডি থানার অধীনে। শ্রীমতী ও বালিয়া নদীর মধ্যবর্তী আবেষ্টনীর মধ্যে একডালা দুর্গের অবস্থানের কারণে অতি সহজেই ইলিয়াস শাহ দিল্লির সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইলিয়াস শাহ যথারীতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই একডালা দুর্গের ধ্বংসাবশেষের কিছুকিছু ঐতিহাসিক চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-৯১) সুলতান হন। ১৩৫৯ সালে ফিরোজ শাহ তুঘলক আবার বঙ্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু একডালা দুর্গের ভৌগোলিক অবস্থান যথারীতি তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সিকন্দর শাহকে সাহায্য করে। সিকন্দর শাহই দেবকোটের বিখ্যাত সাধক মৌলানা আতা শাহের সমাধিতে একটি মসজিদ তৈরি করান।

বাংলার সুলতানি আমলে ইলিয়াসশাহি বংশের অবসানকালে একমাত্র হিন্দু রাজা ছিলেন গণেশ (১৪১৫-১৮)। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশ দিনাজপুরের এই অঞ্চলের ভাতুড়িয়ার বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। 'ভাতুড়িয়া' উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত ভাতুড়া অঞ্চল বলে মনে করা হয়। এখানকার চারদিকে গোলাকার পরিখা ও প্রাচীন ইটের ছড়াছড়ি দেখে স্থানীয় মানুষরা অঞ্চলটিকে 'গণেশের গড়' বলে থাকেন।[১০] ইলিয়াসশাহি বংশের সুলতানদের আমির ছিলেন তিনি এবং ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহের দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি বাংলার সুলতানি যুগের একমাত্র হিন্দু রাজা। তিনি 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন এবং মাত্র কয়েক বছর রাজত্ব করেন। 'দনুজমর্দনদেব' নামে বাংলা হরফে খোদাই করা মুদ্রাও তিনি বের করেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা, সম্ভবত এই 'দনুজ' কথাটি থেকেই দিনাজপুর নামের উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত হল —

"The District of Dinajpur, the name being given as Dinawj or Danoj (Danuj) in Persian histories, unquestionably preserves his name."[১১]

রাজা গণেশের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু সেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নাম নিয়ে দুই দফায় রাজত্ব করেন। প্রথমবার ১৪১৫ সাল থেকে ১৪১৬ সাল এবং দ্বিতীয়বার ১৪১৮ সাল থেকে ১৪৩৩ সাল পর্যন্ত। এই সময়েও দিনাজপুরের এই অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল বলে মনে করা হয়।

পরবর্তীকালে ১৪৯৩ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুলতান হোসেন শাহ্ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবত ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে তিনি গৌড় নগরী থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে একডালায় নিয়ে আসেন। এই সময় দিনাজপুরের এই এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়। রায়গঞ্জ থানার মিরুয়ালে 'ফকিরদিঘি' নামে হোসেন শাহের স্মৃতি বিজড়িত একটি দিঘি রয়েছে। বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দিনাজপুরের অন্তর্গত রায়গঞ্জ থানার ছোটপাঁড়ুয়া নামক স্থানে হোসেন শাহের একটি আবাসস্থল ছিল এবং ছোটপাঁড়ুয়া সেসময় একটি শক্তিশালী মুসলিম শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সম্ভবত দিনাজপুরের হিন্দু সামন্তদের শায়েস্তা করার জন্য দমদমা (দেবকোটের অপর নাম) ও ঘোড়াঘাট দুর্গটিকে হোসেন শাহ্ আরও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। বুকানন সাহেব দিনাজপুর জেলা পর্যটনকালে হেমতাবাদ থানা (উঃ দিনাজপুর) এলাকায় রাজা মহেশের (সম্ভবত গণেশের) রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। এছাড়া নিকটে আরও একটি ইটের তৈরি 'তখত্' -এর বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর লেখায় — "About a mile half beyond this ruin is another, which has been surrounded by a brick wall, and is usually called the Tukht or throne of Hoseyn (Badshah) the king." এই 'তখত্' -এর উচ্চতা কুড়ি ফুট এবং মাথা পিরামিডের আকৃতি। এই 'তখত্' নাকি কন্যার বিয়ের সময় হোসেন শাহ্ নির্মাণ করেন।

হোসেন শাহের মৃত্যুর (১৫১৯ সাল) পর ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত তাঁর বংশধরগণ রাজত্ব করেন। এরপর বাংলায় আফগান শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। বিভিন্ন উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৫৮৫ সালে বাংলা আকবরের মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ১৬০০ সালে সম্রাট আকবর মোগল সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবায় ভাগ করেন। এই সময় পুত্র সেলিমকে সুবা বাংলার শাসক করে পাঠান। প্রশাসনিক কারণে তখন সুবা বাংলাকে চব্বিশটি 'সরকারে' (আধুনিক জেলায়) ভাগ করা হয়। এ ব্যবস্থায় দিনাজপুর অঞ্চলে ছয়টি সরকার গঠিত হয়।

ইভি ওয়েস্ট ম্যাকোট সাহেবের 'The Territorical Aristocracy of Bengal — The Dinajpur Raj' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কাশী নামক এক সাধক ব্রহ্মচারীকে কেন্দ্র করে

দিনাজপুর রাজের উত্থান ঘটে। কালী ও কৃষ্ণের ভক্ত কাশী হাবেলি পিঞ্জরা সরকারে বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। এই যোগী পুরুষের মৃত্যুর পর শ্রীমন্ত দত্ত নামে তাঁর এক শিষ্য সমস্ত সম্পত্তি লাভ করেন। অপুত্রক শ্রীমন্ত দত্তের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর দৌহিত্র শুকদেব রায়। তিনি নিজ ক্ষমতাবলে জমিদারির আয়তন ও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। তাঁর এই বিশাল জমিদারি ও সম্পত্তির মধ্য ও উত্তরাংশ পিঞ্জরা সরকারের অধীন এবং পশ্চিমাংশ তাজপুর সরকারের অধীন ছিল। আর জনতাবাদ সরকারের অধীন ছিল বংশীহারি ও গঙ্গারামপুরের বেশ কিছু অংশ।

শুকদেব রায়ের মৃত্যুর (১৬৭৭ সাল) পর তাঁর পুত্র প্রাণনাথ জমিদারি লাভ করেন। তিনি 'রাজা' উপাধি নিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর (১৬৮২-১৭২২) জাঁকজমকপূর্ণভাবে রাজত্ব করেন। তিনিই প্রাণসাগর নামক দিঘিটি খনন করান। এরপর অপুত্রক প্রাণনাথের দত্তকপুত্র রামনাথ (১৭২২-১৭৬০ সাল) রাজা হন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সম্পদকে তিনি আরও বাড়িয়ে তোলেন। রামসাগর নামক দিঘিটি তাঁর আমলেই খনন করা হয়। রামনাথের মৃত্যুর পর দিনাজপুরের রাজসিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ (১৭৬০-১৭৮০ সাল)। এই সময় ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মোগল সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বভার গ্রহণ পর্যন্ত — মধ্যবর্তী প্রায় দেড়শো বছর দিল্লির রাষ্ট্রনীতিতে নানা উত্থান-পতন ঘটে। পাঠান ও মারাঠারা বারবার বাংলা অভিযান ও আক্রমণ করেন। এইরকম রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে দক্ষিণবঙ্গের ইতিহাসে নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তন হয়। কিন্তু প্রায় সমতল গতিতেই এগিয়ে চলে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলের ইতিহাস।

১৭৮০ সালে খুব অল্প বয়সে কোনও উত্তরাধিকারী না-রেখেই মারা যান রাজা বৈদ্যনাথ। তখন বিধবা পত্নী রানি সরস্বতী রাধানাথকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ (মোহর) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়ে রানি বৈদ্যনাথের উত্তরাধিকারীরূপে রাধানাথের স্বীকৃতির ব্রিটিশ সনদ লাভ করেন। ১৭৯২ সালে রাধানাথ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হওয়ায়, কোম্পানির বিপুল পরিমাণ খাজনা পরিশোধের জন্য রাজ্যের কিছুটা অংশ তাঁকে বিক্রয় করতে হয়। ১৮০১ সালে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

তখন রাধানাথের বিধবা পত্নী প্রাণসুন্দরী গোবিন্দনাথকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮১৭ সালে গোবিন্দনাথ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং পূর্বপুরুষদের ভূসম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ১৮৪১ সালে গোবিন্দনাথের মৃত্যুর পর দিনাজপুর রাজ জমিদারির ভার তাঁর পুত্র তারকনাথের ওপর ন্যস্ত হয়। অপুত্রক তারকনাথ ১৮৬৫ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর বিধবা পত্নী রানি শ্যামমোহিনী দেবী জমিদারি দেখাশোনার জন্য গিরিজানাথকে

দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। গিরিজানাথের মৃত্যুর (১৯১৯ সাল) পর তাঁর পুত্র জগদীশনাথ দিনাজপুরের রাজা হন। তিনি দিনাজপুরের শেষ রাজা। তাঁর সময়েই ১৯৪৭ সালে ইংরেজ রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। তখন জগদীশনাথ পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন এবং ১৯৬২ সালে দেহত্যাগ করেন।

এইভাবে নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে নবজাত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি নতুন জেলা হিসেবে পশ্চিম দিনাজপুরের উদ্ভব ঘটে। আর ১৯৯২ সালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভেঙে গঠিত হয় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটি।

দিনাজপুর রাজের বংশ[১২]

↓

শ্রীমন্ত দত্ত

↓

কন্যা

↓

শুকদেব রায় (১৬৪২-১৬৭৭)

↓

জয়দেব (১৬৭৭-১৬৮২)

↓

প্রাণনাথ (১৬৮২-১৭২২, জয়দেবের ভাই)

↓

রামনাথ (১৭২২-১৭৬০)

↓

বৈদ্যনাথ (১৭৬০-১৭৮০)

↓

সরস্বতী (বৈদ্যনাথের বিধবা পত্নী)

↓

রাধানাথ (দত্তক পুত্র, মৃত্যু - ১৮০১)

↓

প্রাণসুন্দরী (রাধানাথের বিধবা পত্নী)

↓

গোবিন্দনাথ (দত্তক পুত্র, ১৮১৭, মৃত্যু - ১৮৪১)

↓

তারকনাথ (১৮৪১-১৮৬৫)

↓

শ্যামমোহিনী (তারকনাথের বিধবা পত্নী)

↓

গিরিজানাথ (দত্তক পুত্র, ১৮৭৮-১৯১৯)

↓

জগদীশনাথ (১৯১৯-১৯৬২)

↓

জলধিনাথ (১৯২৫-১৯৪১)

৩. ভৌগোলিক পরিচয় ঃ

ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি সাবেক জেলা পশ্চিম দিনাজপুর। পরবর্তীকালে এই পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভাগ করেই তৈরি হয় উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটি, পূর্বেই তা আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ অবস্থান ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত। অবস্থানগত দিক থেকে দুই দিনাজপুর জেলা উত্তরে ২৬°২৯'৫৪" উত্তর অক্ষাংশ (Latitudes) থেকে দক্ষিণে ২৫°১০'৫৫" উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। আবার দ্রাঘিমাগতভাবে পূর্বে ৮৯°০'৩০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ (Longitudes) থেকে পশ্চিমে ৮৭°৪৮'৩৭" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থান করছে এই দুই জেলা।[১৩]

৩.২ সীমানা ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উত্তর সীমান্তে রয়েছে মহানন্দা নদী ও দার্জিলিং জেলা আর দক্ষিণ ভাগে রয়েছে মালদা জেলা, বর্তমান বাংলাদেশের সাবেক রাজশাহি জেলা এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে রয়েছে বাংলাদেশভুক্ত সাবেক বগুড়া জেলা। পূর্বপ্রান্তে রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের সাবেক দিনাজপুর জেলা আর পশ্চিমাংশে বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া, কাটিহার ও কিষাণগঞ্জ জেলা এবং মালদা জেলার উত্তরাংশ। এই বিচিত্র সীমানা, পাশাপাশি ভিন্ন অঙ্গরাজ্য (বিহার) ও বিদেশি রাষ্ট্রের (বাংলাদেশ) অবস্থান দুই দিনাজপুর জেলাকে রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক প্রভৃতি দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মানচিত্রে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য বা মাত্রা দান করেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানচিত্র

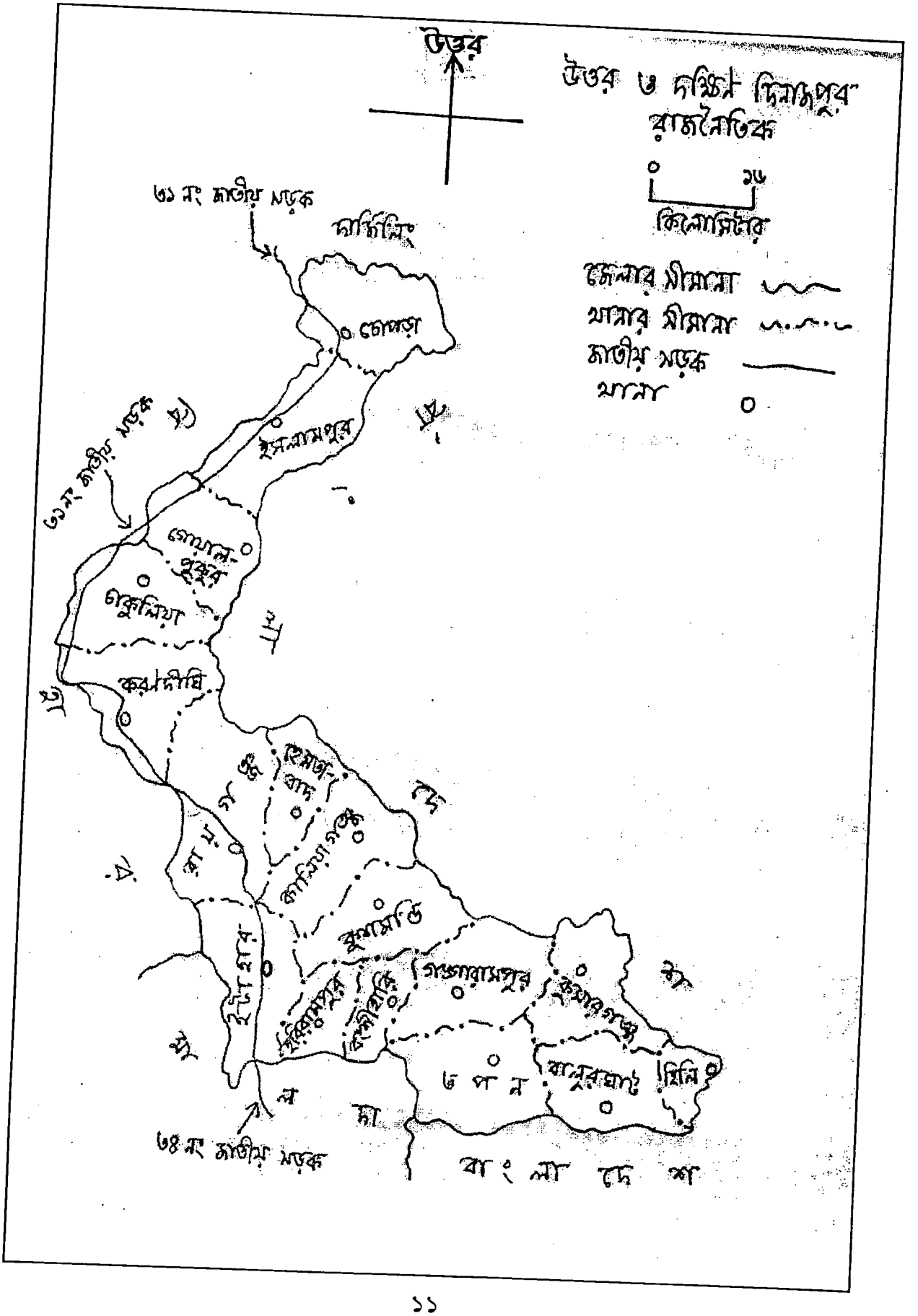

৩.৩ আয়তন ঃ

স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭) থেকে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে এই জেলার আয়তনগত (Territory) সামগ্রিক রূপটিও বারবার পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত হয়েছে।

প্রথমে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ৫৪৮ নং জিএ বিজ্ঞপ্তি (Notification) দ্বারা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মোট থানার সংখ্যা হল ১০ টি। যথা — ১. বালুরঘাট, ২. কুমারগঞ্জ, ৩. গঙ্গারামপুর, ৪. তপন, ৫. রায়গঞ্জ, ৬. হেমতাবাদ, ৭. বংশীহারি, ৮. কুশমণ্ডি, ৯. কালিয়াগঞ্জ এবং ১০. ইটাহার। এরপর ১৯৪৮ সালের ৮ই মে ১৯৫০ নং পিএল বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন থানা হিলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর ১৯৪৮ সালের ১৪ই জুলাই ২১৩৯ নং জিএ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, বংশীহারি, কুশমণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহার থানাগুলো নিয়ে গঠিত হয় রায়গঞ্জ মহকুমা। অপরদিকে বালুরঘাট মহকুমায় রয়ে যায় বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর ও তপন থানাগুলো।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের পরস্পর ভূমি বিনিময় নীতি/আইন (Transfer of Territories) অনুসারে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ৩৮৫৯ নং জিএ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পূর্বতন পূর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ মহকুমার তৎকালীন ঠাকুরগঞ্জ ও চোপড়া থানার কিছু অংশ নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলাভুক্ত চোপড়া থানা গঠিত হয়। ঐ তারিখের ৩৮৬০ নং জিএ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কিষাণগঞ্জ মহকুমার কিছু অংশ নিয়ে ইসলামপুর থানা এলাকা নিরূপিত হয়। একইভাবে ৩৮৬১ নং জিএ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পূর্ববর্তী গোয়ালপোখর ও কিষাণগঞ্জ থানার কিছু অংশ নিয়ে গোয়ালপুকুর থানা এলাকা নির্দেশিত হয়। অনুরূপভাবে ৩৮৬২ নং জিএ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পূর্ববর্তী পূর্ণিয়া (অধুনা কাটিহার জেলা) জেলার কাটিহার মহকুমার করণদিঘি থানা এই জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৫৬ সালের ২রা নভেম্বর ৩৮৭৫ নং জিএ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ এই জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরে অবশ্য মহানন্দা নদীর উত্তর তীরবর্তী অংশ ১৯৫৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখের ১১৭৬ নং জিএ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[১৪]

ফলে সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অংশের আয়তন বৃদ্ধি পায়। তখন ইসলামপুর মহকুমা নামে নতুন মহকুমার সৃষ্টি করা হয়। ইসলামপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয় — ১. ইসলামপুর, ২. চোপড়া, ৩. গোয়ালপুকুর - (১নং), ৪. চাকুলিয়া (গোয়ালপুকুর - ২নং) ও ৫. করণদিঘি থানাগুলো। রায়গঞ্জ মহকুমার অংশে থাকে — ১. রায়গঞ্জ, ২. হেমতাবাদ, ৩. কালিয়াগঞ্জ, ৪. ইটাহার, ৫. বংশীহারি ও ৬. কুশমণ্ডি থানাগুলো। আর সদর মহকুমা বালুরঘাটের

সঙ্গে রয়ে যায় — ১. বালুরঘাট, ২. হিলি, ৩. কুমারগঞ্জ, ৪. গঙ্গারামপুর এবং ৫. তপন থানাগুলো।

১৯৮১ সালে বংশীহারি থানা থেকে বৈরাহাট্টা, বাগিচাপুর, শিরশি ও পুণ্ডরি অঞ্চল এবং ইটাহার থানা থেকে গোকর্ণ ও সৈয়দপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় হরিরামপুর থানা। আর হরিরামপুর থানা সংযুক্ত হয় রায়গঞ্জ মহকুমার সঙ্গে। ১৯৯৬ সালে হরিরামপুর বংশীহারি ব্লক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক ব্লকের মর্যাদা লাভ করে।

সর্বশেষে ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বিভাজনের মধ্য দিয়ে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটির আয়তন সুনির্দিষ্ট হয়। পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মোট আয়তনের (৫৩৫৮ বর্গ কি.মি.) মধ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলাভুক্ত হয় ৩১৩৯ বর্গ কিলোমিটার আর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভাগে থাকে ২২১৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা।

এই বিভাজনের ফলে চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপুকুর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহার — এই নয়টি থানা উত্তর দিনাজপুর জেলাভুক্ত হয়। আর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাভুক্ত হয় — কুশমণ্ডি, হরিরামপুর, বংশীহারি, গঙ্গারামপুর, তপন, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট ও হিলি — এই আটটি থানা। উত্তর দিনাজপুর জেলার দুটি মহকুমা — ১. ইসলামপুর (চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপুকুর, চাকুলিয়া ও করণদিঘি থানা নিয়ে) এবং ২. রায়গঞ্জ সদর (রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহার থানা নিয়ে)। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলারও দুটি মহকুমা — ১. গঙ্গারামপুর (হরিরামপুর, কুশমণ্ডি, বংশীহারি ও গঙ্গারামপুর থানা নিয়ে) এবং ২. বালুরঘাট সদর (তপন, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট ও হিলি থানা নিয়ে)।

৩.৪ আকৃতি ঃ

সামগ্রিকভাবে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটির ভৌগোলিক আকৃতি একটু অদ্ভুত ধরনের। উত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশ চোপড়া থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ হিলি পর্যন্ত বিস্তৃত এই দুই জেলার আকৃতি অনেকটা ধনুকের মতো বাঁকা। উত্তর সীমানা মহানন্দা নদী থেকে দক্ষিণে রায়গঞ্জ শহর পর্যন্ত এই অঞ্চলের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০ থেকে ১২০ কিলোমিটার। সেই তুলনায় এই অঞ্চলের প্রস্থ খুবই কম, কোথাও কোথাও মাত্র ১৫ কিলোমিটারের মতো। আবার রায়গঞ্জ শহর থেকে হিলি থানার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অঞ্চলের দৈর্ঘ্যও প্রায় ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটারের মতো, অথচ এই অংশের প্রস্থ পূর্বের অংশের তুলনায় যথেষ্ট বেশি, সর্বাধিক ৫৫ কিলোমিটারের মতো। এটাই দুই দিনাজপুর জেলার সর্বাধিক প্রস্থ। আসলে জেলা দুটি একত্রে উত্তর থেকে দক্ষিণে খুবই লম্বা কিন্তু চওড়ায় যথেষ্ট কম।

৩. ৫ ভূ-প্রকৃতি ও উদ্ভিদ ঃ

ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। অনেকের মতে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বয়ে আনা পলি সঞ্চয়ের ফলে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। মোটামুটিভাবে জেলা দুটি সমতল ভূমিবিশিষ্ট, তবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু। জেলা দুটির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের মাটি দোঁয়াশ পলিযুক্ত আর পূর্বাংশের মাটি কাঁকরযুক্ত, স্থানীয় ভাষায় যা 'খিয়ার' অঞ্চল নামে খ্যাত। এই দুই অংশের মাটি ধান চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। তবে মালদা জেলা সংলগ্ন দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছুটা অংশ ঢেউ খেলানো এবং লাল রঙের শক্ত অনুর্বর, ল্যাটারাইট ও প্রাচীন পলি গঠিত। এই অঞ্চল 'বরিন্দ্' নামে পরিচিত। এই অংশে ফসল তেমন ভালো হয় না।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কোনো পাহাড় বা পর্বত নেই। তবে জেলা দুটির যেখানে সেখানে উঁচুনীচু মাটির ঢিপি দেখা যায়। এগুলোর আকৃতি ছোটো, বড়ো, মাঝারি নানা ধরনের হয়ে থাকে। চোপড়া ও গোয়ালপুকুর থানা এলাকায় কিছুকিছু প্রাকৃতিক বনভূমি দেখা গেলেও অন্যত্র কোনো বৃহৎ ও গভীর প্রাকৃতিক অরণ্য নেই। তবে দুই জেলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই বনবিভাগ সৃষ্ট বনভূমি চোখে পড়ে। পতিত জমি, রাস্তার ধারে প্রভৃতি স্থানে নতুন উদ্যোগে বৃক্ষরোপণের একটা প্রচেষ্টা জেলা দুটির সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ফলজ ও বনজ গাছের বিপুল সমাহার জেলা দুটির সব জায়গায় দেখা যায়।

৩. ৬ নদী ও জলাশয় ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটি নদীমাতৃক জেলা। এখানে নামকরা নদী যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছোটো ছোটো নদীও। এছাড়া বহু খাল, খাঁড়ি, বিল, বড়ো বড়ো দিঘি বা জলাশয়ও দেখা যায় এখানে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

মহানন্দা ঃ

প্রাচীন ও লোকবিশ্রুত মহানন্দা নদীর উৎপত্তিস্থল দার্জিলিং জেলা। সেখান থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিহারে প্রবেশ করেছে। ইটাহার থানার গোড়াহার ও তারাপুর ঘাটের সংযোগস্থলে নদীটি পুনরায় এই জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর দক্ষিণবাহী হয়ে মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানচিত্র

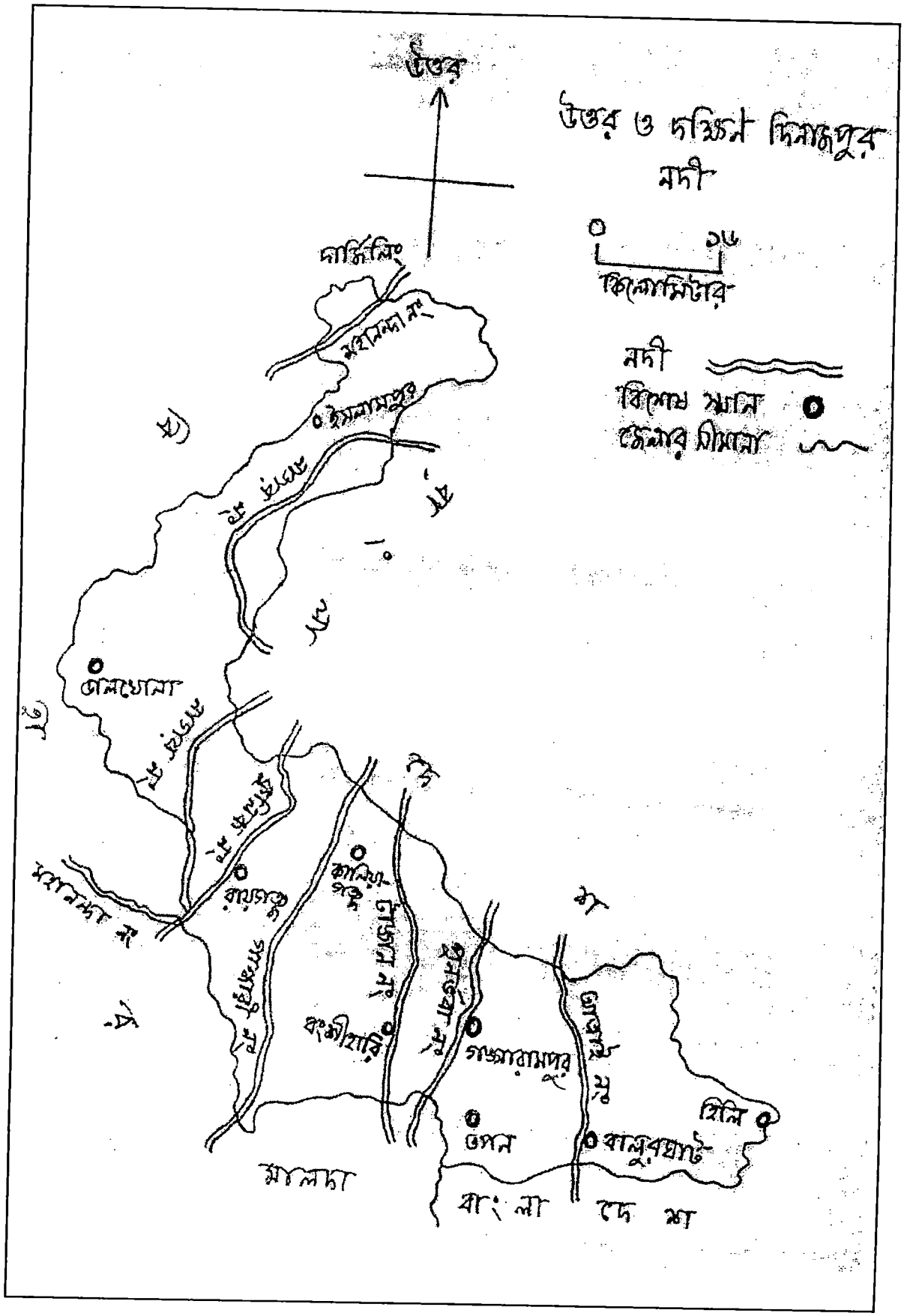

নাগর ঃ

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে নাগর নদী ইসলামপুর মহকুমার সাঁতালিয়া, গোয়ালগছ এলাকা দিয়ে উত্তর দিনাজপুরে প্রবেশ করেছে। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে করণদিঘি ও রায়গঞ্জ থানার মধ্যবর্তী সীমারেখা দিয়ে ক্রমশ বয়ে গেছে। এরপর বিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলার সীমান্ত বরাবর বেশ কিছুটা প্রবাহিত হওয়ার পর ইটাহার থানার গোড়াহার এলাকায় মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

কুলিক ঃ

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলা থেকে কুলিক নদী রায়গঞ্জ থানার বিন্দোলে উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিমবাহী হয়ে রায়গঞ্জ শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। আরও কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে রায়গঞ্জ থানার বিষাহার ও ইটাহার থানার গোড়াহার এলাকায় নাগর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই নদীর তীরেই এশিয়াবিখ্যাত 'কুলিক পক্ষীনিবাস' অবস্থিত।

সুঁই ঃ

সুঁই নাগর নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখা নদী। এটি পশ্চিম থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বয়ে গেছে। তারপর ইটাহার থানা এলাকায় মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজস্ব গতিপথের সমাপ্তি টেনেছে।

গান্ধারী ঃ

গান্ধারী (গামারী) নদীর উৎসস্থল রন্ধনীপাড়া বিল। সেখান থেকে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে কালিয়াগঞ্জ থানার মধ্য দিয়ে (প্রায় ২৫ কিমি) ইটাহার থানায় প্রবেশ করেছে। তারপর ইটাহার থানার বরোট-এ সুঁই নদীতে পতিত হয়েছে।

শ্রীমতী ঃ

শ্রীমতী (স্থানীয় ভাষায় 'চিরামতি') নদীটি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরপর দুটি ধারায় ভাগ হয়ে কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি থানার ত্রিসংযোগ (Tri-junction) রচনা করেছে। তারপর উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ও দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর থানার মধ্যবর্তী সীমারেখা বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে। ইতিহাসখ্যাত একডালা দুর্গ এই শ্রীমতী ও

বালিয়া নদীর মধ্যবর্তী স্থানেই গড়ে উঠেছিল।

টাঙ্গন ঃ

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে টাঙ্গন নদী পিরগঞ্জ ও বোচাগঞ্জ হয়ে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার সংযোগকারী সীমানা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। তারপর দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি ও বংশীহারি থানার মধ্য দিয়ে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে। নদীটি বেশ গভীর ও প্রশস্ত বলে পূর্বে নৌকা চলাচলের উপযোগী ছিল। কিন্তু বর্তমানে টাঙ্গন তার নাব্যতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। এই নদীর তীরেই বংশীহারি স্থানটি অবস্থিত।

পুনর্ভবা ঃ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য নদী হল পুনর্ভবা। নদীটি বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার উত্তর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। তারপর ক্রমশ দক্ষিণবাহী হয়ে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্যবর্তী সীমারেখা টেনে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদীরই পূর্বতীরে অবস্থিত ইতিহাসখ্যাত 'দেবকোট' বা ' বাণগড়'।

আত্রাই ঃ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিখ্যাত নদী আত্রাই (আত্রেয়ী)। বাংলাদেশ থেকে প্রবাহিত হয়ে আত্রাই কুমারগঞ্জ থানার উত্তর সীমা দিয়ে ঢুকে পড়েছে এই জেলায়। তারপর সোজা গতিপথে বয়ে গেছে বালুরঘাট পর্যন্ত। সেখান থেকে ক্রমশ দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে নদীটি আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বর্ষাকালে প্রচুর জল বহন করলেও পুনর্ভবা ও আত্রাই নদীর গর্ভ জলবাহিত মাটি ও পলির দ্বারা ক্রমশ ভরাট হয়ে চলেছে।

ইছামতী ঃ

বাংলাদেশ থেকে আগত ইছামতী নদীটি কুমারগঞ্জ থানা এলাকা দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর আত্রাই নদীর সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে প্রায় ১৫ কিলোমিটার বয়ে গেছে। অবশেষে রাধানগরে আত্রাই-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের গতিপথের সমাপ্তি টেনেছে।

LIBRARY
NBU, DARJEELING

যমুনা ঃ

দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি ছোটো নদী যমুনা। বাংলাদেশ থেকে হিলি থানা এলাকার

18 DEC 2012

241117

উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে নদীটি এই জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর মাত্র ৫ কিলোমিটারের মতো পথ হিলি থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে যমুনা পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

এই সমস্ত ছোটোবড়ো নদী ছাড়াও দুই দিনাজপুর জেলায় রয়েছে বেশ কিছু দিঘি বা পুষ্করিণী। এগুলোর মধ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনদিঘি, ধলদিঘি, কালদিঘি, মহিপালদিঘি, প্রাণসাগর, মালিয়ানদিঘি, গৌড় (গড়) দিঘি, আলতা-দিঘি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দিঘিগুলোর প্রত্যেকটি আয়তনে সুবিশাল এবং বহু প্রাচীনকালে খনন করা হয়েছিল। পানীয় জল ও কৃষিকাজে জল সেচের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিখ্যাত 'ধলদিঘি মেলা' ধলদিঘির পাড়ে বসে। এক সময় এই মেলায় বিপুল জনসমাগম হলেও এখন আর সেই ঐতিহ্য নেই।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষি প্রধান জেলা। এছাড়া মৎস্যচাষ এখানকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কৃষিকাজ, সেচব্যবস্থা ও মৎস্যচাষের উপর এই সমস্ত নদী ও জলাশয়গুলোর প্রভাব কিন্তু যথেষ্ট। আর এ কারণেই জনজীবনের উপর এগুলোর ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেই ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

৪. জনগোষ্ঠীর পরিচয় ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষই সর্বাধিক। তবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তুলনায় সামান্য হলেও বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও এই দুই জেলায় বসবাস করেন। ২০০১ সালের জনগণনার তথ্য (Census Report) অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটির ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হার নিম্নরূপ —

উত্তর দিনাজপুর জেলা —

মোট জনসংখ্যা	—	২৪,৪১,৭৯৪ জন
হিন্দু	—	৫১.৭২ শতাংশ
মুসলমান	—	৪৭.৩৬ শতাংশ
খ্রিস্টান ও অন্যান্য	—	.৯২ শতাংশ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা —

মোট জনসংখ্যা	—	১৫,০৩,১৭৮ জন
হিন্দু	—	৭৪.০১ শতাংশ
মুসলমান	—	২৪.০২ শতাংশ
খ্রিস্টান ও অন্যান্য	—	১.৯৭ শতাংশ

৪. ১ ধর্মীয় পরিচয় ঃ

তথ্য অনুযায়ী উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় হিন্দু ধর্মের জনসংখ্যাই অধিক। হিন্দু সমাজভুক্ত লোকেরা হলেন — ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, সাহা, গোয়ালা, জেলে, কৈবর্ত, নমশূদ্র, কেওট, রাজভর প্রভৃতি শ্রেণির (Sub-caste) মানুষ। এছাড়া রয়েছেন বর্মন, সরকার, রায়, দেবশর্মা, সিংহ পদবিধারী পলিয়া, দেশিয়া ও রাজবংশী সমাজভুক্ত তপশীলি জাতির মানুষ। আর রয়েছেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, কুর্মি, পাহাড়িয়া, মালপাহাড়িয়া সমাজভুক্ত উপজাতি সমাজের মানুষ।

হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুর সংখ্যা যথেষ্ট কম। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে যে, একটি গ্রামে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণের মধ্যে মাত্র কয়েকটি পরিবার হয়তো উচ্চবর্ণের হয় আর বাদবাকি সব জনগণই নিম্নবর্ণের। নিম্নবর্ণের জনগণের মধ্যে তপশীলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত জনগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই দুই জেলার হিন্দু সমাজভুক্ত জনগণের একটা বড়ো অংশ ওপার বাংলা (বাংলাদেশ) থেকে আগত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১ লাখ ১৫ হাজার ৫ শো ১০ জন উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১৫] ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৯৭ হাজার ৮ শো ৩৯ জন। এছাড়া জেলা শাসকের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬১ সালে অন্যান্য স্থান থেকে আগত জনগণের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ৯ শো ৬ জন।[১৬] এই আগন্তুক জনসংখ্যার সিংহভাগই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দু সম্প্রদায়। এখানে উল্লেখ্য যে, এগুলো সরকারি পরিসংখ্যান মাত্র। এই পরিসংখ্যানের বাইরেও চোরাই পথে কত উদ্বাস্তু শরণার্থী হিন্দু ওপার বাংলা ত্যাগ করে এই জেলা দুটিতে আশ্রয় নিয়েছেন বা এখনও নিচ্ছেন, তার কোনো লিখিত তথ্যপ্রমাণ নেই।

১৯৬১ সালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩,২৩,৭৯৭ জন। এই পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটির জনবিন্যাসে এই উদ্বাস্তু (Refugee) শ্রেণির জনগণের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসিত এই জনগণের মধ্যে যেমন উচ্চবর্ণের হিন্দু রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন নিম্নবর্ণের হিন্দুও। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে তপশীলি জাতিভুক্ত রয়েছেন অনেকেই। তবে তপশীলি উপজাতির সংখ্যা খুবই সামান্য।

সংখ্যাগত বিচারে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় হিন্দুদের পরেই রয়েছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান সমাজের স্থান। এখানকার মুসলমান সমাজ প্রধানত — ১. আস্রফ বা শরিফ ও ২. আজলাফ — এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। শরিফরা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হলেও

সামাজিক বিচারে অভিজাত এবং শিক্ষাদীক্ষায় যথেষ্ট উন্নত। আর আজলাফরা সংখ্যায় অধিকতর কিন্তু সামাজিক বিচারে সাধারণ শ্রেণির মানুষ। এঁরা সাধারণত কৃষিনির্ভর এবং হিন্দু সমাজের সঙ্গে এঁদের সম্পর্কও বেশ হৃদ্য।

এই দুই জেলার বিভিন্ন স্থানে আরেক শ্রেণির মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। তাঁরা নিজেদের 'শেরশাবাদিয়া' সমাজভুক্ত মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তবে স্থানীয় মুসলমান ও হিন্দুদের কাছে তাঁরা 'বাদিয়া মুসলমান' বলে পরিচিত। এঁরা প্রধানত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আগত এবং সংখ্যায় অতি অল্প। এঁরা কঠোর পরিশ্রমী হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বেশ কয়েক হাজার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লোক দেখা যায়। এঁদের প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। এঁদের বেশির ভাগই পূর্বে তপশীলি উপজাতিভুক্ত ছিলেন, বর্তমানে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান সমাজভুক্ত হয়েছেন।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটির প্রায় ৯০ শতাংশ জনগণ গ্রামে বসবাস করেন। প্রতিটি গ্রামেই সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন পাড়া থাকে। যেমন সাঁওতাল পাড়া, দেশিয়া পাড়া, পলিয়া পাড়া, মুসলমান পাড়া, রিফিউজি পাড়া (স্থানীয় ভাষায় রিপুজি/নিপুজি পাড়া), তুরি পাড়া প্রভৃতি। এই পাড়াগুলো একক হিসেবে যুক্ত হয়ে এক একটি গ্রাম গড়ে তুলে। নির্দিষ্ট পাড়ায় নির্দিষ্ট সমাজের লোকেরা বসবাস করেন। তবে রিফিউজি পাড়ায় এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হয় না। সেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর (গোয়ালা, জেলে, নমশূদ্র, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, মাহিষ্য প্রভৃতি) উদ্বাস্তু লোকেরা মিলেমিশে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে থাকেন। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সামাজিক জীবনচর্যা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি পালন করে থাকেন। প্রয়োজন বোধে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দের বিচার করেন, শাস্তি দেন বা দণ্ডবিধান করে থাকেন। আবার প্রয়োজন বোধে দণ্ড মকুবও করে থাকেন।

তবে কতকগুলো সর্বজনীন উৎসব-অনুষ্ঠানে পাড়া নির্বিশেষে গ্রামের সমগ্র হিন্দুসমাজ একত্রিত হয়ে থাকেন। যেমন — কালীপুজো, সরস্বতীপুজো, নামসংকীর্তন, মনসাগান প্রভৃতি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজও সত্যপিরের পুজো, পিরের 'থান' ও দরগায় নানা রকম মানত করে থাকেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হলে মানত করা উপহার সামগ্রী সেখানে উৎসর্গ করে থাকেন। উদ্বাস্তু অভিবাসিত সম্প্রদায়ের মানুষরাও দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজো, কালীপুজো, ষষ্ঠীপুজো, চড়কপুজো, হরিবাসর, গোপালপুজো, পৌষ-পার্বণ প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠান ধুমধাম সহকারে পালন করে থাকেন।

৪.২ শিক্ষা ঃ

শিক্ষা যে-কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর

জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ওপর শিক্ষার এই প্রভাব যথেষ্টই। কারণ এখন এই দুই জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। দু-চার কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে উচ্চ বিদ্যালয়। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ও এখন আর অপ্রতুল নয়। বেশির ভাগ ব্লকেই গড়ে উঠেছে নতুন নতুন মহাবিদ্যালয়। শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নিচের পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়।[১৭]

অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ

সাল		মোট
১৯৪৭	—	৫৫১ টি
১৯৫৬-৫৭	—	৯৪৯ টি
১৯৬০-৬১	—	১০৬৭ টি
১৯৮১-৮২	—	২৪৪০ টি

অন্যান্য শ্রেণির বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ

১৯৪৭ সালে মিডল স্কুলের মোট সংখ্যা	—	৩১ টি
১৯৬০-৬১ সালে মিডল স্কুলের মোট সংখ্যা	—	৬১ টি
১৯৮১-৮২ সালে মিডল স্কুলের মোট সংখ্যা	—	৯৫ টি
১৯৪৭ সালে হাই স্কুলের সংখ্যা	—	৬ টি
১৯৫৬-৫৭ সালে হাই স্কুলের সংখ্যা	—	১৬ টি
১৯৬০-৬১ সালে হাই স্কুলের সংখ্যা	—	২৭ টি
১৯৮১-৮২ সালে সেকেণ্ডারি স্কুলের সংখ্যা	—	১১৬ টি

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বিভক্ত হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রের এই পরিবর্তনের সূচক আরও ব্যাপক ও দ্রুতহারে পালটাতে থাকে। ২০০১ সালের পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি অনুমান করা যায়।[১৮]

উত্তর দিনাজপুর জেলা —

প্রাথমিক বিদ্যালয়	—	১৪৩৮ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	—	১৯৫ টি
শিশুশিক্ষাকেন্দ্র	—	৯২৩ টি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা —

প্রাথমিক বিদ্যালয়	—	১১৭৭ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	—	১০৬ টি
শিশুশিক্ষাকেন্দ্র	—	৫৩৫ টি

তবুও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো এখনও সমানভাবে পৌঁছাতে পারেনি। ২০০১ সালের জনগণনার তথ্য অনুসারে উভয় দিনাজপুর জেলায় সাক্ষরতার হার নিম্নরূপ[১১] —

উত্তর দিনাজপুর জেলা —

সার্বিক সাক্ষরতার হার	—	৪৭.৮৯ শতাংশ
পুরুষ সাক্ষরতার হার	—	৫৮.৪৮ শতাংশ
স্ত্রী সাক্ষরতার হার	—	৩৬.৫১ শতাংশ
শহরাঞ্চলে সাক্ষরতার হার	—	৮০.৫০ শতাংশ
গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার	—	৪২.৮৬ শতাংশ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা —

সার্বিক সাক্ষরতার হার	—	৬৩.৫৯ শতাংশ
পুরুষ সাক্ষরতার হার	—	৭২.৪৩ শতাংশ
স্ত্রী সাক্ষরতার হার	—	৫৪.২৮ শতাংশ
শহরাঞ্চলে সাক্ষরতার হার	—	৮৩.২৮ শতাংশ
গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার	—	৬০.৩৮ শতাংশ

উপরের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটির বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। সার্বিক সাক্ষরতার ব্যাপারে উত্তর দিনাজপুর জেলার চেয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বেশ খানিকটা এগিয়ে। আবার পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীরা উভয় জেলাতেই বেশ কিছুটা পিছিয়ে। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে সার্বিক শিক্ষার প্রসার কয়েক ধাপ এগিয়ে। একথা সত্য যে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উঁচুতলায় শিক্ষার আলো পৌঁছালেও, নিচুতলায় তেমনভাবে প্রসার লাভ করতে পারেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। এছাড়াও তপশীলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত

জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে অনীহা। তাছাড়া পরিবেশপরিস্থিতি, জীবনজীবিকা ও অর্থনৈতিক কারণেও অনেকেই শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না বা পাঠালেও অল্প দিনের মধ্যে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে দেন। পরিবর্তে মহাজনবাড়ি, চায়ের দোকান, কুলকর্ম বা অন্য কোনো জায়গায় কাজে লাগিয়ে দেন। ফলে এঁদের নতুন প্রজন্মও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তবে বর্তমানে দিনকাল দ্রুত পালটে যাচ্ছে। সর্বসাধারণকে শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রসারের জন্য সমস্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিউ সেট আপ স্কুল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই সমস্ত প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি সহযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশুশ্রমিক শিক্ষাকেন্দ্র, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র প্রভৃতি। একশো শতাংশ শিক্ষার লক্ষ্যে সারা বছর ধরে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তপশীলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী সকল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাভাতা ও পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিপূর্বেই প্রাথমিক স্তরের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে 'মিড্-ডে মিল' দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেছে। উচ্চপ্রাথমিক স্তরেও যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের 'মিড্-ডে মিল' দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। প্রতিটি শিশুকিশোরকে বিদ্যালয়মুখী করা এবং বিদ্যালয় ছুটদের পুনরায় শিক্ষার অঙ্গনে ফিরিয়ে আনার জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষাকে আরও হৃদয়গ্রাহী, সহজ ও ভবিষ্যৎ কর্মমুখী করার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প এবং সর্বশিক্ষা মিশনের পক্ষ থেকে নিরলস প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ফলে গ্রামগঞ্জে, এমনকি প্রত্যন্ত এলাকাতেও সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আর এ কারণেই বিদ্যালয়গুলোতে এক ধাক্কায় পড়ুয়াদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সিংহভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা হলেও মাতৃভাষা-রূপে সাঁওতালি, হিন্দি, উর্দু, ওরাওঁ/কুরুক, মুণ্ডারি প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারকারী জনগণের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তবু এখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ভাষাভাষীকেই বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। তবে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি, সংস্কৃত, আরবি অথবা অন্য কোনো ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ পঠনপাঠনের সুবিধাও উচ্চপ্রাথমিক (Upper Primary) স্তরে (নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে) রাখা হয়েছে। বর্তমানে ইংরেজি ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসেবেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে (English Medium School গুলোতে) পঠনপাঠনের মাধ্যম করা হয়েছে।

৪. ৩ জীবিকা ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় ৮০ শতাংশ লোকের জীবিকা কৃষিকাজ। এখানকার কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত লোকদের চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন —

খেতমজুর ঃ

এঁদের নিজস্ব কোনো জমিজায়গা নেই। এঁরা অন্যের জমিতে মজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে কাজ পাওয়া এবং পরিমাণের ওপর। ফলে এঁদের ভবিষ্যৎ অনেকটা অনিশ্চিত বলা যায়।

ভাগচাষি ঃ

এঁদের কারও কারও অল্পস্বল্প জমি রয়েছে, আবার অনেকের তাও নেই। জীবিকা নির্বাহের জন্য এঁরা অন্যের জমি ভাগে চাষ করেন। উৎপন্ন ফসলের শতকরা প্রায় ৫০-৬০ ভাগ এঁরা পেয়ে থাকেন। এঁদের জীবিকা অনিশ্চিত হলেও অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়।

ছোটো কৃষক ঃ

এঁদের মোটামুটি জমিজায়গা রয়েছে এবং এঁরা নিজের জমি নিজেই চাষ করে থাকেন। কৃষিতে রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল বীজ, আধুনিক প্রযুক্তি সর্বোপরি জলসেচের সুবিধা গ্রহণ করার ফলে এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই বলা যায়।

ধনী কৃষক ঃ

এঁদের জায়গাজমির পরিমাণ যথেষ্ট। এঁরা নিজেরা জমি চাষ না করে খেতমজুর বা ভাগচাষি দিয়ে নিজেদের জমি চাষ করিয়ে থাকেন। কৃষিজীবীদের মধ্যে এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থাই সবচেয়ে ভালো।

জলের অভাবের জন্য দুই দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু এলাকায় কৃষিজীবীরা সারা বছর ধরে চাষ-আবাদ করতে পারেন না। আবার এখানকার কৃষিব্যবস্থা প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির কারণেও অনেক সময় চাষবাসের ক্ষতি হয়। তখন অনেকেই অর্থ সংস্থানের জন্য মজুরের কাজ করতে বাধ্য হন বা অন্যান্য কাজ করে কষ্টের সঙ্গে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। তবে বর্তমানে কৃষিতে জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার ক্রমেই উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিরাট সংখ্যক মানুষ কুটিরশিল্পের মাধ্যমেও জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। এঁদের মধ্যে কেউ বা কামার, কুমোর, তাঁতি, গোয়ালা আবার কেউ বা ছুতোর, ধোপা, জেলে, নাপিত। এই সমস্ত জাতিগত পেশার ওপর নির্ভর করে এঁরা সংসার চালান। এছাড়াও বাঁশের কাজ, ধোকরা তৈরি, মুড়ি ভাজা, গহনা প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ করেও অনেকে অর্থের সংস্থান করে থাকেন। তবে সংসার সচ্ছল রাখার জন্য প্রায় সকলেই হাঁস, মুরগি, গবাদিপশু পালন করে থাকেন। এতে কিছু বাড়তি রোজগারও হয়। বর্তমানে এগুলোকে অনেকেই জীবিকা হিসেবেও গ্রহণ করছেন।

এগুলো ছাড়াও উভয় দিনাজপুরের বহু মানুষ দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের আর্থিক চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। অনেকে ভ্যান, রিকশা, ভটভটি, অটোরিকশা চালান। বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ছোটোখাটো ব্যাবসা করেন। অনেকেই আবার সরকারি ও বেসরকারি চাকরি করেন অথবা শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে এই দুই জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে অনেকটা পিছিয়ে, বলা চলে অনগ্রসর এলাকা। এখানকার প্রায় ৪০ শতাংশ অধিবাসী এখনও দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাস করেন। দুর্বল আর্থসামাজিক কাঠামো হওয়ার কারণে এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান ও শিক্ষাদীক্ষার অগ্রগতি আশানুরূপ নয়।

৪. ৪ ভাষা সম্প্রদায় ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধিবাসীদের অধিকাংশের মাতৃভাষা হল বাংলা। আবার মাতৃভাষা বাংলা নয়, এমন জনগণের প্রধান ব্যবহারিক ভাষাও হল বাংলা। কিন্তু উভয় জেলার জনগোষ্ঠীতেই বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় রয়েছেন। আর রয়েছেন ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকে আগত অবাঙালি জনগণ। আবার ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের পরস্পর ভূমি বিনিময় নীতির ফলে বিহার রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চল ও জনগণ উত্তর দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ফলে এই দুই জেলায় মূল ব্যবহৃত ভাষা বাংলা হলেও অন্যান্য ভাষা সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও বর্তমান রয়েছে।

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে[২০] অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারকারী জনগণের আনুপাতিক হার ছিল —

মাতৃভাষারূপে বাংলা ব্যবহার করেন	—	৭২.১৯ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে উর্দু ব্যবহার করেন	—	১০.১৪ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে সাঁওতালি ব্যবহার করেন	—	৯.২৯ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে হিন্দি ব্যবহার করেন	—	৫.৩৮ শতাংশ লোক

মাতৃভাষারূপে কুরুক/ওরাওঁ ব্যবহার করেন — ১.৪৪ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে মুণ্ডারি ব্যবহার করেন — ০.৮৮ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করেন — ০.৬৮ শতাংশ লোক

১৯৭১ সালের জনগণনায়[২১] এই আনুপাতিক হার দাঁড়ায় নিম্নরূপ —

মাতৃভাষারূপে বাংলা ব্যবহার করেন — ৭৮.২২ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে উর্দু ব্যবহার করেন — ৬.০৫ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে হিন্দি ব্যবহার করেন — ৫.৩ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে সাঁওতালি ব্যবহার করেন — ৮.৮ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে কুরুক/ওরাওঁ ব্যবহার করেন — ১.১ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে মুণ্ডারি ব্যবহার করেন — ০.০৬ শতাংশ লোক
মাতৃভাষারূপে অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করেন — ০.৪৭ শতাংশ লোক

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটির সর্বত্র মাতৃভাষা মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। তবে সব জায়গায় সব ভাষা সম্প্রদায়ের জনবসতির ঘনত্ব সমান বা একরূপ নয়। এক এক এলাকায় এক একটি মাতৃভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অধিক।

উর্দু ভাষা ব্যবহার করেন এমন জনসম্প্রদায় প্রধানত উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া, চাকুলিয়া, ইসলামপুর প্রভৃতি থানার বিভিন্ন অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় বসবাস করেন। এঁদের প্রায় সবাই মুলসমান সম্প্রদায়ভুক্ত। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এঁরা প্রায় সবাই প্রচলিত বাংলা আঞ্চলিক কথ্যভাষা বোঝেন এবং প্রয়োজনে বলতে বা ব্যবহার করতেও পারেন।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় সর্বত্রই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জনগণ কমবেশি বসবাস করেন। তবে এঁদের অধিক পরিমাণে দেখা যায় দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন, বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, বংশীহারি, হরিরামপুর এবং উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার, রায়গঞ্জ ও করণদিঘি থানার বিভিন্ন অঞ্চলে।

জীবনজীবিকার প্রয়োজনে বহু অবাংলাভাষী জনগণ অন্যান্য প্রদেশ থেকে এসে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করছেন। এঁরা নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষারূপে হিন্দি ব্যবহার করেন। তবে ব্যবহারিক প্রয়োজনে অন্যান্য ভাষা সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁরা বাংলা ভাষাতেই ভাব বিনিময় করে থাকেন।

এই জেলা দুটিতে ওরাওঁ বা কুরুক ভাষা ব্যবহারকারী জনগণের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। এই ভাষা সম্প্রদায়ের জনগণ প্রধানত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি, তপন, গঙ্গারামপুর,

বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ থানার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে থাকেন। উত্তর দিনাজপুর জেলায় এঁদের প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে।

মুণ্ডারি ভাষা সম্প্রদায়ের জনগণের সংখ্যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ৯ হাজার ৫ শো ৮৯ জন। তাঁদের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বসবাস করেন মাত্র ১ হাজার ৮ শো ৫২ জন।[২২] এই পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটিতে বর্তমানে এঁদের সংখ্যা বেশি নয়।

প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জনগোষ্ঠী বাংলা, উর্দু, সাঁওতালি, হিন্দি, ওরাওঁ ও মুণ্ডারি প্রভৃতি ভাষা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অবশ্য এই ভাষা সম্প্রদায়গুলোর প্রায় সব জনগণই একটি মাত্র ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং তা হল বাংলা ভাষাগোষ্ঠী। এই দুই জেলার অধিকাংশ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার কারণে ভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিজেদের গণ্ডির বাইরে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংস্পর্শে থাকার কারণেও এঁদের দ্বিতীয় ভাষা হল বাংলা ভাষা। তাই বলা চলে যে, বাংলা ভাষা সম্প্রদায় ভিন্ন এখানকার অন্য ভাষা সম্প্রদায়ের প্রায় সবাই বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে Bi-lingual বা দ্বিভাষাভাষী।

১৯৬১ সালের জনগণনা[২৩] অনুসারে অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বাংলা ভাষা দ্বিতীয় ভাষা মাধ্যমরূপে ব্যবহারকারী বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল —

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
সাঁওতালি ব্যবহারকারী —	২২১৯৪	২০৫৫৮	৪২৭৫২ জন
হিন্দি ব্যবহারকারী —	১০১৯৬	৫৭৭০	১৫৯৬৬ জন
কুরুক বা ওরাওঁ ব্যবহারকারী—	৪৯৯৯	৪৩৭৭	৯৩৭৬ জন
উর্দু ব্যবহারকারী —	২৯৮৯	১৩৫০	৪৩৩৯ জন
মুণ্ডারি ব্যবহারকারী —	১৫৫৮	১৩৭৭	২৯৩৫ জন

১৯৭১ সালের জনগণনায় এই পরিসংখ্যান দাঁড়ায় নিম্নরূপ —

সাঁওতালি ভাষা ব্যবহারকারী মোট জনসংখ্যা	—	১৬৩৬৫৫ জন
হিন্দি ভাষা ব্যবহারকারী মোট জনসংখ্যা	—	৯৮৭৩৯ জন
কুরুক/ওরাওঁ ভাষা ব্যবহারকারী মোট জনসংখ্যা	—	২০৪৮০ জন
উর্দু ভাষা ব্যবহারকারী মোট জনসংখ্যা	—	১১২৪১৩ জন
মুণ্ডারি ভাষা ব্যবহারকারী মোট জনসংখ্যা	—	১১৯২ জন

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মূল ভাষা বাংলা ঠিকই, তবে এই বাংলা ভাষা চলিত বা শিষ্ট বাংলার (Standard Bengali) অবিকল রূপ নয়। এই বাংলা ভাষা এখানকার গ্রাম্য অধিবাসীদের নিজস্ব কথ্য বাংলা বা আঞ্চলিক উপভাষা (Dialect)। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পূর্ব ও পরবর্তীকাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু উদ্বাস্তু জনগণ ওপার বাংলা (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে দুই দিনাজপুর জেলায় আশ্রয় নিয়েছেন বা এখনও নিচ্ছেন। এঁরা পূর্ব বাসস্থানে বাংলা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন উপভাষা এলাকায় ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এঁরা এই দুই জেলার অধিবাসীরূপে এই উপভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বা হচ্ছেন। এই জনসম্প্রদায় বাড়িতে, পাড়ায় বা গ্রামে এবং বাইরের স্বজাতি বা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ওপার বাংলার আঞ্চলিক উপভাষাতেই কথা বলেন, ভাব বিনিময় করেন। এই অভিবাসিত জনসম্প্রদায়ের অবস্থান বিভিন্ন গঞ্জ ধরনের জায়গায় এবং এঁদের অনেকেই দোকানদার, ব্যবসায়ী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার কারণে স্থানীয় জনগণও এঁদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের সময় ভাষা মাধ্যম হিসেবে অভিবাসিত জনগণের উপভাষাকেই ব্যবহারের চেষ্টা করে থাকেন। রিফিউজি অধ্যুষিত এলাকার বিভিন্ন বাজারঘাট, বাসস্ট্যাণ্ড, লোকালয় প্রভৃতি সংযোগস্থানে এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে এই দুই জেলার ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষারও গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে বলে মনে করা হয়।

৪.৫ অভিবাসিত জনগণ ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটিতে বসবাসকারী জনগণের একটা বড়ো অংশ অভিবাসিত মানুষ। সেই পরিসংখ্যান পূর্বেই দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এঁরা কালচক্রের পেষণে রাষ্ট্রনৈতিক তথা ধর্মীয় কারণে ওপার বাংলা (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে জীবনজীবিকা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে এখানে এসে হাজির হয়েছেন বা এখনও হচ্ছেন।

তবে এইভাবে ওপার বাংলা থেকে জনগণের এপার বাংলার উত্তরবঙ্গে আসার সূচনা কিন্তু বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই, বলা চলে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে। এ প্রসঙ্গে নির্মল দাশ মহাশয় লিখেছেন — "কয়েক শো বছর এইভাবে চলতে চলতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে উত্তরবঙ্গে চালু হল বাংলার আরও একটি কথ্য উপভাষা। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে চা-শিল্পের পত্তন হয় এবং কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কলকাতার ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতিদেবীর বিবাহসূত্রে (১৮৭৫) করদ মিত্ররাজ্য কোচবিহারে ব্যাপক আধুনিকীকরণ শুরু হয়। এই উপলক্ষে এই সময় থেকে পূর্ববঙ্গের বঙ্গালী উপভাষা এলাকা এবং নিম্ন উত্তরবঙ্গের পাবনা-রাজশাহি-বগুড়া জেলার বরেন্দ্রী উপভাষা এলাকা থেকে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তরা চাকরি এবং ওকালতি-ডাক্তারি-শিক্ষকতার মতো স্বাধীন পেশা ও ব্যবসার

সূত্রে উত্তরবঙ্গে আসতে থাকে। এই নবাগত বাঙালিরা শিক্ষাদীক্ষা, বৈষয়িক বুদ্ধি ও বিত্ত কৌলীন্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্ভ্রম উদ্রেক করত এবং তাদের কাছে 'বাবু' নামে পরিচিত হত।"[২৪]

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। মূলত এই সময় থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় জন্মভূমি ত্যাগ করে হিন্দুস্থান তথা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটিতেও (পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর) দলে দলে আশ্রয় নিতে থাকেন। তারপর গঙ্গা-যমুনা-পদ্মা দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গেছে। কিন্তু ওপার বাংলা থেকে লোক আসার শেষ হয়নি।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে এবং বাংলাদেশ নামে বিশ্বমানচিত্রে স্থান করে নেয়। বর্তমানে গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে। সর্বোপরি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে। তবু বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে লোক আসার আজও অন্ত নেই। এভাবেই উভয় দিনাজপুর জেলায় অভিবাসিত জনগণের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। এটা বাস্তব সত্য, একে অস্বীকার করার উপায় নেই।

এইভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা সময়ে বহু মানুষ দুই দিনাজপুর জেলায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং এখনও নিচ্ছেন। স্থানীয় দেশি-পলি-আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে এই অভিবাসিত জনগণ 'রিপু' এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে এঁরা 'রিপুজি' নামে পরিচিত। তবে নিজেদের মধ্যে এঁরা সাধারণত পূর্ব বাসস্থানের পরিচয়েই পরিচিত। যেমন — ঢাকা অঞ্চলের অধিবাসী হলে 'ঢাকাইয়্যা' বা 'ঢাকি', পাবনা অঞ্চলের হলে 'পাবনাইয়্যা' বা 'পুব্যা', রাজশাহি অঞ্চলের হলে 'রাজশাইয়্যা' বা 'বিল্যা হুদু' ইত্যাদি। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অভিবাসিত জনগণের সিংহভাগই হল বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহি, দিনাজপুর, ঢাকা বা পাবনা জেলা থেকে আগত। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে আগত কিছুকিছু অভিবাসিত জনগণও এখানে বসবাস করেন।

এই অভিবাসিত জনগণের মাতৃভাষা প্রধানত বাংলা ভাষা। তাই ভাষিক অবস্থানের দিক থেকে এঁরা বাংলা ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই অভিবাসিত জনগণের মধ্যে সামান্য কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাঁরা মাহাতো এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় (মাহাতো সম্প্রদায় মাহাতো ভাষায় এবং আদিবাসীরা সাঁওতালি বা নিজেদের ভাষায়) ভাব বিনিময় করে থাকেন। তবে ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই দুই সম্প্রদায়ের জনগণ বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন, ভাব আদানপ্রদান করে থাকেন।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অভিবাসিত জনগণ ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে এঁদের মধ্যে হিন্দুধর্মের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পদ্ধতি নিয়ে নানা

মতপার্থক্য দেখা যায়। সেদিক থেকে এঁদের কেউ বা বিষ্ণুর উপাসক, কেউ বা কালীর উপাসক, আবার কেউ বা শিবের উপাসক। এঁদের মধ্যে অনেকেই নানান লৌকিক দেবদেবীর পুজোও করে থাকেন। তবে অধিকাংশ অভিবাসিত জনগণই একই সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো ও উপাসনা করে থাকেন। সেদিক থেকে এঁরা পঞ্চোপাসক বলা চলে। ইদানীং এঁদের মধ্যে গুরুবাদের প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। ধর্মীয় আচারনিয়ম এঁরা নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন। ফলে এঁদের মধ্যে কিছুটা ধর্মীয় কঠোরতা ও গোঁড়ামি দেখা যায়।

এখানকার অভিবাসিত জনগণের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। দেশত্যাগ জনিত কারণে অনেকের হাতে উপযুক্ত পরিমাণে চাষের জমি নেই। আবার অনেকেই বেশ কিছু জায়গাজমি, পুকুর করে নিয়েছেন। এঁদের জীবিকা অর্জনে তেমন অসুবিধা না হলেও ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের সংসার চালানোর জন্য উদয়াস্ত কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করতে হয়। অনেকেই কৃষিকাজের পাশাপাশি ভ্যান, রিকশা, ঠেলা চালান, শ্রমিকের কাজ করেন। জাতিগত পেশার প্রতি এঁদের ঝোঁক দেখা যায়। তাই জাতি বা বংশগতভাবে এঁদের কেউ বা কামার, কুমোর, তাঁতি, জেলে, আবার কেউ বা নাপিত, ছুতোর, গোয়ালা প্রভৃতি কুলকর্ম করে জীবিকানির্বাহ করেন। এঁদের অনেকেই ছোটোখাটো ব্যাবসা বা দোকান করে প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাড়তি রোজগারের জন্য এঁরা একই সঙ্গে দু-তিন ধরনের পেশা বা কর্ম অবলম্বন করে থাকেন।

অভিবাসিত জনগণের বেশ কিছু মানুষ সরকারি বা বেসরকারি চাকরি করেন অথবা শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এঁদের মধ্যে আজ আর উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের অভাব দেখা যায় না।

৪.৬ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঃ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলোর মতো উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দুটিতেও অভিবাসিত জনগণ স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সহাবস্থান করে আসছেন। সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, এমনকি মানসিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে অভিবাসিত জনগণের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এঁদের বসবাসের পাড়াগুলোও স্থানীয়দের থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন। আবার যাঁরা বিনিময় করে এদেশে এসেছেন, তাঁদের বাড়িগুলো তো মুসলমান পাড়ার মধ্যেই অবস্থিত। তবু দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে বসবাস, উঠাবসা, ভাববিনিময়, সামাজিকতা, বন্ধুত্বের খাতিরে উভয় জনসম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে। ফলে সামান্য দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে এঁদের সহাবস্থানের ক্ষেত্রে বড়ো কোনো সমস্যা বা বিরোধ দেখা দেয় না।

স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে অভিবাসিত জনগণের ধর্মমতে মিল থাকলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁদের ধর্মগতভাবে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে অভিবাসিত জনগণ মুসলমান সম্প্রদায়ের ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে থাকেন। আবার এও বলা চলে যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের কারণেই এই অভিবাসিত জনগণ দেশত্যাগ করে এখানে এসেছেন। তবুও বিভিন্ন কাজকর্মে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁদের যথেষ্ট সদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু বিষয়ে মতভেদ বা সাম্প্রদায়িক বিরোধ যে দেখা দেয় না, তা নয়। তবে সেটা সাময়িক ব্যাপার।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান ও সহাবস্থান করে থাকেন। যেমন রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুসলমান সমাজ ও অভিবাসিত উদ্বাস্তু সমাজ সাগ্রহে যোগদান করে থাকেন এবং বেশ প্রীতি প্রদর্শনও করে থাকেন। আবার মুসলমান সমাজের সত্যপিরের নিকটে রাজবংশী-অভিবাসিত নির্বিশেষে শিন্নি মানত করেন। মহরম ও পিরের মেলায় জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুমুসলমান, উঁচুনীচ সবাই যোগদান করেন। রাজবংশী সমাজ আয়োজিত 'ক্ষণগান', 'নোটুয়া গান', 'বিষহরী গান' প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে মুসলমান ও অভিবাসিত সমাজের লোকের অভাব হয় না। আবার অভিবাসিত জনগণের চড়কপুজো, দুর্গাপুজো প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলাগুলোতে মুসলমান ও অন্যান্য হিন্দু সমাজের লোকেরা নির্দ্বিধায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

এছাড়াও নবান্ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক উৎসবগুলোতে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও খুশিমনে সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যোগদান করেন এবং নিজেদের কৃতজ্ঞ মনে করে থাকেন। এভাবেই উভয় দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

টীকা নির্দেশ ঃ

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার - বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭।

২. ধনঞ্জয় রায় - দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, পৃ. ২।

৩. ধনঞ্জয় রায় - দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, পৃ. ৩।

৪. ধনঞ্জয় রায় - দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, পৃ. ৪।

৫. পুরাতত্ত্ব বিভাগের নেতৃত্বে বর্তমানেও বাণগড়ের খনন কাজ চলছে এবং নিত্যনতুন ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হচ্ছে।

৬. Kunja Govinda Goswami - Exavations at Bangarh, Chapter - V.

৭. Epigraphia Indica and Records of the Archaelogical Survey of India, Volume - XXI, p. 79.

৮. ধনঞ্জয় রায় - দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, পৃ. ৬।

৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত) - বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২।

১০. ধনঞ্জয় রায় - দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, পৃ. ১০৫।

১১. Suniti Kr. Chatterjee - Kirata-Jana-Kriti, p. 63.

১২. ধনঞ্জয় রায় - দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, পৃ. ১৪৪।

১৩. West Bengal District Gazetteers, West Dinajpur, 1965, Government of West Bengal, p. 1.

১৪. West Bengal District Gazetteers, West Dinajpur, 1965 — গ্রন্থ থেকে বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে, পৃ. ৩-৫।

১৫. ধনঞ্জয় রায় - দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, পৃ. ৩৪৬।

১৬. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী - পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, পৃ. ২৯।

১৭. ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়েছে — West Bengal District Gazetteers, West Dinajpur, (1965) থেকে, পৃ. ১৯৫-১৯৬ এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা - সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

১৮. ২০০১ সালের জনগণনা এবং Internet থেকে সংগৃহীত ২০০৬ সালের তথ্য অনুসারে (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত)।

১৯. ২০০১ সালের জনগণনা এবং Internet থেকে সংগৃহীত ২০০৬ সালের তথ্য অনুসারে (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত)।

২০. West Bengal District Gazetteers, West Dinajpur (1965), p. 60.

২১. Census of India - 1971, Series - 22, Part - 11, C - 11 - পরিসংখ্যান থেকে শতকরা হিসেব বের করা হয়েছে।

২২. উত্তরবঙ্গের ভাষা, সম্পাদকের নিবেদন (রতন বিশ্বাস সম্পাদিত)।

২৩. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী - পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, পৃ. ৩৪।

২৪. উত্তরবঙ্গের বাংলা ভাষা প্রবন্ধ, গ্রন্থ উত্তরবঙ্গের ভাষা (রতন বিশ্বাস সম্পাদিত), পৃ. ২৩।

_____****_____